আমার কম্পিউটার শিক্ষার খুঁটিনাটি

আমি কম্পিউটার বিদ্যায় স্বশিক্ষিত একজন লোক। পেশায় ডাক্তার। কিছুটা স্বশিক্ষিত আধুনিক শৌখিন কৃশক। আমার ছোট মেয়ে ডাঃ মার্জিয়া ইসলাম দীনা বলে আব্বু বাইরে ডাক্তার ভিতরে ইঞ্জিনিয়ার। সেল্ফের অর্ধেক বই মেডিকেলের অর্ধেক বই কম্পিউটার সাইন্সের। আমি কিভাবে স্বশিক্ষিত হলাম তা আজ লিখলাম।

যতদুর মনে আছে কম্পিউটার শব্দটা আমি প্রথম শুনেছি ১৯৮০ সনে। তখন আমি এম বি বি এস প্রথম বর্সের ছাত্র। ডাইনিং -এ বসে টেলিভিশনে একটি মেগাজিন অনুসঠান দেখছিলাম। উপস্থাপক ছিলেন আনিসুল হক। বর্তমানে ঢাকা উত্তরের মেয়র। তিনি কোন একটি সংখ্যা তত্বের কথা বলছিলেন যা কিনা কম্পিউটার দিয়ে হিসাব করে দেখা হয়েছে। এতবড় হিসাব মানুসের দ্বারা করা কঠিন। এমন একটা যন্ত্রের প্রতি আমার আরও জানতে আগ্রহ হল। এর যেখানেই একটু আধটু কম্পিউটার নিয়ে পত্রিকায় লিখা হত আমি পড়তাম।

জানুয়ারি ১৯৯২ সনে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে প্রভাষক হয়ে প্যাথলজি বিভাগে প্রবেশ করলাম। এর আগে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে ছিলাম। অধ্যক্ষ ছিলেন অধ্যাপক মোফাখখারুল ইসলাম স্যার। খুব সম্ভব তখন ভাইস প্রিন্সিপ্যাল কেউ ছিলেন না। প্রিন্সিপাল স্যারের রুমের বিপরীত দিকের রুমে দরজার উপরে লিখা ছিল " কম্পিউটার রুম, দরজা বন্ধ রাখুন এসি চলছে। " বুঝতে পারলাম এবার কম্পিউটার দেখার সুযোগ এসেছে। আনিস ভাইর কাছে জিগালাম
-কম্পিউটার রুম সবসময় তালামারা থাকে, ওটা খুলেন কে, কখন খোলা হয়। ওখানে সবসময় এসি চলে নাকি?
-ওটা একমাত্র চালাতে পারে সাইদুল ইসলাম স্যার। তিনি জাপান থেকে পিএইচডি করা। তিনি ঐ দেশ থেকে কম্পিউটার চালনা শিখেছেন। ওনাকে ছাড়া আর কেউ পারেন না। চাবি শুধু ওনার কাছেই।
-এসি চলে কেন?
-কম্পিউটারের ব্রেইন মানুসের থেকেও পাওয়ারফুল। ওটাকে সবসময় ঠান্ডা রাখতে হয়।
-সারা কলেজে তো মাত্র দুইটি এসি আছে। একটি প্রিন্সিপ্যাল স্যারের রুমে আরেকটি কম্পিউটার রুমে।
-আসলে ওটা ছিল ভাইস প্রিন্সিপাল রুম। এখন তো ঐ পদে কেউ নেই।
-
আমি মাঝে মাঝে ঐ রুমের পাস দিয়ে হেটে যাই এই আশায় যে কোন দিন হয়ত আমার সামনেই দরজা খুললে দরজার ফাকে এক পলক দেখে নিব। এক দিন দেখি তালা খোলা, দরজা একটু ফাক হয়ে আছে। আমি চুপিসারে চোরের মত ফাক দিয়ে তাকালাম। দেখলাম ১২ ইঞ্চি সাদাকালো টেলিভিশনের মত একটি জিনিস। তার সামনে একজন খাটো স্যার ফুর্তিতে নড়াচড়া করছে। মনিটরের পর্দার উপর একেক দিক থেকে একেকটি প্যারাট্রুপ আসছে, তিনি নিচে একটি বোর্ডে বুতাম টিপছেন, সাই সাই করে গুলি বের হচ্ছে, আর প্যারাট্রুপ পরে যাচ্ছে।

ভাবলাম এটা আবার কেমন কম্পিউটার। আসলে তিনি তখন প্যারাট্রুপার গেম খেলছিলেন। যতবড় পিএইডিই হোন খেলার নেসা সবার আছে। খেলাও সব জায়গায় আছে। কম্পিউটার দেখা হল। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পুরুন হল। আমি যে দেখেছি তা কেউ দেখল না। আর দেখতে আগ্রহও হল না।

জুলাই ১৯৯৩ সনে পিজিতে ভর্তি হলাম এম ফিল (প্যাথলজি) পড়তে। পিজির তখন নাম ছিল আইপিজিএমআর, এখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে আমাদের ল্যাবে একটি কম্পিউটার ছিল ঐটার মতই। খুশী হলাম এবার এটা ব্যাবহার করার সুযোগ পাব। ওটা শুধু যারা থিসিস পার্টে তারাই ব্যবহার করার সুযোগ পান। আমাদের এক ব্যাচ আগে ছিলেন আমাদের কামরুল ভাই। এখন তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়-এর ভাইস চেন্সেলর, অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান স্যার। তিনি এবং তার ব্যাচের সৈয়দ ভাই, নুরুল ইসলাম ভাই আমাকে কম্পিউটারে টাইপ করা ও প্রিন্ট করা শিখায়েছেন। মাউস ছিল না। ফ্লাট সিপিউ এর উপর মনিটর বসানো ছিল। সামনে একটা ছোট কিবোর্ড। সাইডে একটা ডট প্রিন্টার। ফ্লপি ডিস্কে ডাটা সেইভ করে রাখতাম। ডস অপারেটিং সিস্টেম ছিল। ওয়ার্ড স্টার দিয়ে ফাইল কম্পোজ করতাম। এরো টিপে পয়েন্টার সড়াতাম। টেগ দিয়ে লেখা বোল্ড ইটালিক করতাম। এই ভাবেই আমরা আমাদের থিসিস বই টাইপ করে প্রিন্ট করেছি।

একবার এক মজার কান্ড হয়ে গেল। দুপুর ১ টার সময় ছয়তলা থেকে পাচতলার রুমে এসে হন্ত দন্ত হয়ে আমাদের ব্যাচের নব কুমার এসে বললেন "কম্পিউটার এর কি বোর্ড চুরি হয়ে গেছে। " আমি ও হারুন বসেছিলাম সেখানে। আমরা একই ব্যাচের। সমসাময়িক এমবিবিএস। নব সলিমুল্লাহ, হারুন ঢাকা আর আমি ময়মনসিংহ মেডিকেল-এর গ্রাজুয়েট। নব কুমার সাহা এখন সিলেট এম এ জি ওসমানী এবং হারুন অর রশিদ খান শিল্পী সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের অধ্যাপক। আমি কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। যাহোক, আমরা তিনজন দৌড়িয়ে কম্পিউটার রুমে গেলাম। লিফটের দরজার সাথেই কম্পিউর রুম। ধারনা হল লিফট দিয়েই হয়ত চোর কিবোর্ড নিয়ে সাচ্ছন্দে নিচে নেমে গেছে। আমাদের ধারনা ছিল এই কিবোর্ড এর দাম প্রায় ৬০/৭০ হাজার টাকা হতে পারে। হারালে আমাদের তিনজনকেই শেয়ার করতে হবে। মাথা গরম হয়ে গেল। তিন জন তিন গেইটের দিকে দৌড়ালাম। ততক্ষনে চোর গেইট দিয়ে বের হয়ে হয়ত বাসে উঠে চম্পট দিয়েছে। দশ মিনিট পর তিন জনই বিফল হয়ে ফিরে এলাম। নব কুমারের মুখ ফেকাশে হয়ে গেল। আমি আশ্বাস ফিলাম "টেনশন কইরেননা, আমরা তিন জনই এটার দাম শেয়ার করব। " শিল্পী বললেন "তাড়াতাড়ি কামাল স্যারকে জানানো দরকার"।

কামাল স্যারকে আমরা বাঘের চেয়েও ভয় পেতাম। তিনি ছিলেন সহকারী অধ্যাপক। পরে তিনি অধ্যাপক ও বিভাগের চেয়ারম্যান হন। বিশ্বখ্যাত হিস্টোপাথলজিস্ট। সার্ক একাডেমি অব প্যাথলজি এর চেয়ারম্যান। তিনি অধ্যাপক মোহাম্মদ কামাল। তখন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন অধ্যাপক বি আর খান স্যার। শিখাতেন বেশী কামাল স্যার, শাশন করতেন বেশী কামাল স্যার, বন্ধুও ছিলেন কামাল স্যার।

আমরা কামাল স্যারকে খোজলাম। তিনি বি আর খান স্যারের সাথে কথা বলছেন। অনুমতি নিয়ে ভিতরে ঢুকলাম।কামাল স্যার বললেন
- কি সমস্যা?
-(নব) আমাদের কিবোর্ডটা কিছুক্ষন আগে চুরি হয়েছে, স্যার।
-কিভাবে হল?
-স্যার, প্রিন্ট করতে গিয়ে কাগজ শেষ হয়েছিল। আমার সাথে কেউ ছিল না। আমি দরজা খোলা রেখে নিচ তলায় গিয়েছিলাম কাগজ আনতে। এর মধ্যেই চোর এসে চুরি করে লিফট দিয়ে নেমে চম্পট দিয়েছে। আমরা তিন জন তিন গেইট পর্যন্ত গিয়েছিলাম। ধরতে পারিনি।
-কেন দামী জিনিস রেখে দরজা খোলা করে চলে যাবেন? যান এটা কিনে দিবেন।
-স্যার, তবুও স্যার, আরেকটু চেষ্টা করে দেখি ধরতে পারি কিনা। যাই?
-যান।
আমরা ঘুরে ফিরে যাচ্ছিলাম। স্যার ডাকলেন
- দাড়ান।

আমরা ঘুরে দাড়ালাম। দেখলাম কিবোর্ডটা টেবিলের উপর। হয়ত এতখন ড্রয়ারে রাখা ছিল।
- নিয়ে যান। আর কখনো এমন অসতর্ক হবেন।

আমরা কিবোর্ড নিয়ে বের হলাম। বাইরে এসে হাসি আর চেপে রাখতে পারলাম না। ফিক ফিক করে কিক কিক করে হাসি বেরিয়ে পরল। নিচ তলায় গিয়ে কিছুক্ষন ফ্রি স্টাইলে হেসে নিলাম। পরে মার্কেটে গিয়ে খোজ নিয়ে দেখি একটা নতুন কিবোর্ড এর দাম মত্র দুই শত টাকা। শুনে থার্ড রাউন্ড হেসে নিলাম। এখন ২১ বছর পরও একটি নতুন কিবোর্ড-এর দাম দুইশত টাকা।

জুলাই ১৯৯৫ সনের এম ফিল ফাইনাল পরীক্ষার রেজল্ট হল ডিসেম্বরের দিকে। পাশ করলাম সবাই। মার্চ ১৯৯৬ সনে আবার প্রভাষক পদে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে ফিরে আসলাম প্যাথলজি বিশেষজ্ঞ হয়ে। এসে দেখি নতুন একটা কম্পিউটার আছে। ঐ রুমের নাম আদর করে দেয়া হয়েছে কম্পিউটার ল্যাব। লেটেস্ট অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ ৯৫। এম এস অফিসে কাজ করতে হয়। এক মাত্র অফিস এসিস্টেন্ট তোফাজ্জল ঢাকা থেকে সরকারি ভাবে ট্রেইনিং নিয়ে এসেছেন তাই তিনিই শুধু চালাতে পারেন। আমিও পারি না, সাইদুল ইসলাম স্যারও পারের না। খোজ পেলাম ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের প্রভাষক আবুল মনসুর ভাইর। শহরের বিভিন্ন পিলারে লিখা ছিল কম্পিউটারে রুগী দেখা হয়। গেলাম তার প্রাইভেট চেম্বারে কম্পিউটারের ব্যবহার দেখার জন্য। চেম্বার ডিজিটাল যন্ত্রপাতি দিয়ে ভরা। যন্তরমন্তর আরকি। কম্পিউটার, স্কেনার, প্রিন্টার, মাইক্রোফোন, লাউড স্পিকার, স্টান্ড ক্যামেরা ইত্যাদি। লাউড স্পিকারে রুগীকে প্রশ্ন করেন, রুগী হত বিহ্বল হয়ে উত্তর দেন, রুগীর ছবি নড়াচড়া করে, রুগী চেয়ে দেখে সে কম্পিউটারে ঢুকে গেছে। মনসুর ভাই রুগীর ডাটা এম এস ওয়ার্ডে টাইপ করে, প্রেস্কিপশন টাইপ করে সিলেক্ট করে রিডিং কমান্ড দেন। কম্পিউটার রোবটিক ভয়েসে লাউড স্পিকারে পড়তে থাকে "টেবলেট এভেলিন, ওয়ান টেবলেট থ্রাইস ডেইলি '" ইত্যাদি। এসিস্টেন্ট রুগীর হাতে প্রিন্ট করা প্রেস্ক্রিপশন দিয়ে বলেন "এই গুলি খেতে বললেন। " রুগী চলে যায়, রুগী ঢুকে। এভাবে চলছে সারাক্ষন। আমি বললাম
-এগুলি কি করছেন?
-এগুলি সবাই আধা পাগলা রুগী। রোগ ধরা সহজ। চিকিৎসা ও সহজ।

ব্যপারটা আমার পছন্দ হল না। তুবুও দেখলাম যে ইনি কম্পিউটার ভাল বুঝেন। তার কাছ থেকে কম্পিউটার এর বিভিন্ন জ্ঞান শিখতে লাগলাম ভাল কিছু করার উদ্দেশে। তাকে আমি উস্তাদ মানলাম। আমার মত আরও দুই জন পাওয়া গেল যারা কম্পিউটার শিখতে আগ্রহী। একজন মাইক্রোবায়োলজির আকরাম স্যার (বর্তমানে প্রফেসর) আরেকজন পেডিয়াট্রিক্সের ইকবাল ভাই।

১৯৯৭ সনে মনসুর ভাই প্রস্তাব দিলেন কলেজে কম্পিউটার ব্যাবহারের উপর একটা সেমিনার করলে ভাল হয়। আমরা রায় দিলাম। বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইউনিভারসিটির কয়েকজন ছাত্র একটা কম্পিউটার ক্লাব করেছিল। তারা আমাদের কলেজে একটা ফ্রি সেমিনারের আয়োজন করল। আবুল মনসুর ভাই ছিলেন এটার কো-অর্ডিনেটর। আমরা আমাদের কনফারেন্স রুমে সব শিক্ষক উপস্থিত ছিলাম। এখানে সুন্দর করে একদম সাম্প্রতিক দময়ের কম্পিউটার ব্যাবহারের সব দিক আমরা জানতে পারি। আমরা সবাই আগ্রহ প্রকাশ করলাম কম্পিউটারের উপর ট্রেইনিং নিতে। মেডিসিন বিভাগের প্রধান আলমগির স্যারকে কমিটির সেক্রেটারি করে একটা কমিটি করা হল। কলেজেই অফিস টাইমের পুর্বে এক ঘন্টা করে দুই মাস আমরা ক্লাস করলাম। সার্টিফিকেট দেয়া হল। মোটামুটি জানা হল। কম্পিউটারে কাজ করতে হাত নিশপিশ করে, কিন্তু কেমনে করি, নিজের তো কম্পিউটার নাই। আমি, আমিনুল ভাই ও গোলন্দাজ ভাই আবুল মনসুর ভাইকে ধরলাম কম্পিউটার কিনে দিতে। আমিনুল ভাই তখন সহকারী অধ্যাপক

ছিলেন, পরে অধ্যাপক ও প্রিন্সিপ্যাল হয়ে অবসর নিয়েছেন। গোলন্দাজ ভাই এখন বিএমএ ময়মনসিংহ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক। তখন ময়মনসিংহ কম্পিউটারের দোকান ছিল না ।একটা মাইক্রবাস ভাড়া করে মনসুর ভাইকে সাথে নিয়ে আমরা তিনজন ঢাকায় গেলাম। কলাবাগান সুপার কম্পিউটার থেকে প্রতিটি ৬৮ হাজার করে তিন জনে তিনটি কম্পিউটার কিনলাম। সাথে নিলাম কমদামী ইংক জেট প্রিটার। এটা ছিল ১৯৯৮ সন। তখনকার ১ টাকা এখনকার ৫ টাকার সমান। মাঝখানে মনসুর ভাই একটু ভিতরে গিয়েছিলেন। ফিরে আসলে জিজ্ঞেস করলাম
- কোথায় গিয়েছিলেন?
-একটা সফটওয়্যার নিলাম।
-সেটা কেমন জিনিস?
-কেমনে বুঝাব!

আমরা তিন জনই এ বিষয়ে অজ্ঞ। গোলন্দাজ ভাই হেসে বললেন - নরম জিনিস মনে হয়।
সফটওয়্যার বুঝতে আমার অনেকদিন লেগেছে।

কম্পিউটার নিয়ে বাসায় ফিরলাম রাতে। রাতেই বাসায় ইন্সটল করে রাত তিনটার ঘুমাতে গেলাম। এরপর বাংলা মিডিয়ামে লিখা কম্পিউটার ইউজার গাইড কিনে এর বিভিন্ন সুবিধা গুলি ভোগ করা শুরু করলাম। আমার হাতে লিখা ক্লাস নোটগুলি টাইপ করা শুরু করলাম। আমার স্ত্রী কেও কম্পিউটার ব্যাবহার করা শিখালাম। আমার নোট গুলি টাইপ করার কাজে সেও হেল্প করল।

একে একে কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায় এই সব ডিভাইস বাজারে আসলেই কিনে ফেলতাম। তখন ময়মনসিংহেও কয়েকটি কম্পিউটারের দোকান হয়ে গেছে। দোকানদাররাও যেনে গেছে আমার বিশেষ কম্পিউটার নেশার কথা। কোন একটি নতুন আইটেম আসলেই আমাকে খবর দেয়া হয়। সাথে সাথে আমি কিনে ফেলি সবার আগে। ক্রমান্নয়ে আমি কিনলাম মাইক্রোফোন, স্পিকার, স্কেনার, ওয়েবক্যাম, ডিজিটাল ক্যামেরা, ইন্টেরনাল টিভি কার্ড, ইন্টারনাল ফেক্স মডেম, এক্সটারনাল মোডেম, পেন ড্রাইভ, পেন ক্যাম, পাম টপ, এম পি ৩ প্লেয়ার, কার্ড ড্রাইভ, ব্লু টুথ এডাপ্টর, ব্লু টুথ ইয়ার ফোন, ডিজিটাল আই পিস ক্যামেরা, ফ্লাস কার্ড, মেমোরি কার্ড, কার্ড রিডার, ট্যাব, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, এনালগ স্পিকার, ডিজিটাল স্পিকার, ওয়াই ফাই রাউটার, স্মার্ট টিভি ইত্যাদি।

মাইক্রোফোন দিয়ে কথা রেকর্ড করে মজা পেতাম।এটা কিনেছিলাম ১৯৯৮ সনে । এখনো ভাল আছে, ব্যাবহার করি । স্কেনার দিয়ে বইয়ের ছবি স্কেন করে ক্লাসে দেখাতাম। নিজেদের প্রিন্ট করা ছবি গুলি স্কেন করে সিডি করে রাখতাম। ওয়েব ক্যাম দিয়ে বাসায় নিজেদের ভিডিও করতাম এনং নেটে বিদেশে আত্বীয়দের সাথে দেখে কথা বলতাম। টিভি কার্ড দিয়ে এক অংশে কম্পিউটারে টাইপ করতাম আরেক অংশে মনিটরে টিভি দেখতাম। ভাল ভাল অনুষ্ঠান রেকর্ড করে রাখতাম। প্রথম ডিজিটাল ক্যামেরাটি গিফট পাই। দিয়েছিল আমার এমবিবিএস ক্লাস মেট ফার্স্ট বয় ডাঃ দীপক। সে জাপান থাকত। বিশ্বে প্রথম লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন টিমের একজন সার্জন। এখন লন্ডন থাকে। ইমেইলে খুব যোগাযোগ হত। দেশে এসে আমাকে দেয়। জানত যে এটার জন্য আমিই প্রযোস্টহানামাকে ছাড়া আর কারো তখন এটা দেখি নাই । ইন্টারনাল মোডেম দিয়ে ফেক্স করতাম ও টিএনটি টেলিফোনে ইন্টারনেট সংযোগ দিতাম। একবার এক ছাত্র য়ামার প্রাইভেট ল্যাবে এসে বলল "স্যার, ইন্টারনেটে আমাদের এডমিশন টেস্টের রেজাল্ট দিয়েছে । শহরে কোথাও কোন দোকানে নেট কানেকশন পেলাম না । শুনলাম আপনি নেট ব্যাবহার করেন । একটু কি উপকার করবেন ?" আমি বললাম "আমার নেট কানেকশন বাসায় । রাতে বাসায় গিয়ে দেখব । রোল নাম্বার দাও ।"
- স্যার, সাথে আমাদের বন্ধুদের আরো ২ টি রোল নাম্বার দেই ?

- দাও ।
আমি রাতেই রেজাল্ট বের করে রঙ্গিন প্রিন্টার দিয়ে প্রিন্ট করে ল্যাবের ইনভেলাপে ভরে পরেরদিন তাকে দিলাম । সবাই পাস ।
-স্যার, কত টাকা দিব?
-টাকা দিবে কেন?
-আপনার নেট খরচ?
-এটা দিতে হবে না ।
-নিতে হবে স্যার, কেমন খরচ ?
-এটার খরচ হিসাব করা যাবে না, খুবই সামান্য, আবার বিরাট খরচও বলা যায় ।

ওরা আমাকে টাকা দিতে পারল না । পরেরদিন ল্যাবে গিয়ে দেখি ও আরও ২০ জন ছাত্র নিয়ে এসেছে । আমি বললাম
-এত ঝামেলা করলে তো নেট চালানো যাবে না ।
-স্যার, আমরা ২০ জনের ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করাব ।
-কেন ?
-এমনি, জানার জন্য ।

২০ জনের ব্লাড গ্রুপ করে দিলাম । দুই হাজার টাকা বিল দিল ।

ময়মনসিংহে তখন ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডার ছিল না । ঢাকার ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডার থেকে নেট কানেকশন নিয়েছিলাম । মিনিটে ২ টাকা চার্জ । ইন্টারনাল ফেক্স মডেমের মাধ্যমে টিএনটি টেলিফোনে ডায়াল আপ করে নেটে কানেকশন পেতাম । টেলিফোন লাইন ততক্ষন এনগেজড থাকত । তাই যতক্ষন নেটে থাকতাম ততক্ষন মিনিটে ৭ টাকা টেলিফোন চার্জ উঠত । তার মানে মিনিটে আমার খরচ হত ৯ টাকা । এত টাকা খরচ করে আমি নেট থেকে বিভিন্ন রকম জ্ঞান আহোরন করতাম । শিখতাম । ২৭ হাজার টাকা খরচ করে ১৯৯৮ সনে টেলিফোন কানেকশন নিয়েছিলাম । তার সাথে ১৮ হাজার টাকা দিয়ে ওয়ারলেস লাগিয়ে সারা শহর থেকে টেলিফোন রিসিভ করতাম । বিনা খরচে ওয়ারলেসে বাসায় ও ল্যাবে কথা বলতাম । তারও কিছু দিন আগে নকিয়া মোবাইল ফোন কিনেছিলাম। একটি মাত্র দোকান ছিল। দোকানদার বললেন "আপনার মোবাইল টি ময়মনসিংহে ৭ম মোবাইল। গত কাল ৬সঠ মোবাইল টি কিনেছেন ডাঃ ক্যাপ্টেন (অব) মুজিব। " আমি কেনার পর ফোন করার মত কারো নাম্বার পেলাম না। টেস্ট করার জন্য মুজিব ভাইকে ফোন করলাম। তিনি তখন ক্লিনিক মালিক ছিলেন। পরে এম পি ও মন্ত্রী হন। এন্টিনাযুক্ত মোটা মোবাইল ছিল। পুরু কা কাভার ছিল। পকেটে রাকা কষ্টকর ছিল। টেবিলের উপর রেখে দিতাম। অনেকে উতশুক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত। সারাদিনেও কোন কল আসত না। কল রেট ছিল মিনিটে ৭ টাকা।

পেন ড্রাইভে কলমের মাথার মত ক্লিপ থাকত। আমার একটা পেন ড্রাইভ আছে। এখন সবাই ফ্ল্যাশ ড্রাইভকে পেন ড্রাইভ বলছে। কলমের মত ক্লিপওয়ালা হল পেন ক্যামেরা। আমি এটা পকেটে লাগিয়ে রাখতাম। সময়মত ছবি ও ভিডিও নিতাম ।কেউ বুঝতে পারত না। ইউএসবি ক্যাবল দিয়ে কম্পিউটারে ছবি ও ভিডিও সেইভ করে রাখতাম। পরে বন্ধুদের দেখাতাম, বিশ্মিত হত। আমাকে ছাড়া আর কারো কাছে পেন ক্যাম দেখি নি। এটা কিনেছিলেন মনসুর ভাই। তিনি কয়েকদিন হয়ত ব্যাবহার করেছিলেন। দেখামাত্রই আমি নিয়ে নেই। আমিই আমাদের বন্ধুদের মধ্যে প্রথম পাম টপ ব্যাবহার করি। এন্ড্রয়েড মোবাইলের মতো, স্ক্রিনে স্টিক দিয়ে লিখতাম, আকতাম, কম্পিউটারে সেইভ

করতাম, মিউজিক শুনতাম, ভিডিও দেখতাম। কম্পিউটার থেকে গান নিয়ে এম পি ৩ প্লেয়ারে কানে লাগিয়ে শুনতাম। ব্লু টুথ আডাপ্টার দিয়ে এক কম্পিউটারের থেকে আরেক কম্পিউটারের ডাটা আদান প্রদান করতাম। ব্লুটুথ ইয়ার ফোনে বিনা তারে কম্পিউটারের মিউজিক শুনতাম। কম্পিউটারে ব্লু টুথ আডাপ্টার লাগিয়ে মোবাইল দিয়ে ক্লাসে দূর থেকে পাওয়ার পয়েন্ট ক্লাস নিতাম। ডিজিটাল আই পিস ক্যামেরা হল মাইক্রোস্কোপ আই পিচে ডিজিটাল ক্যামেরা লাগানো থাকে। ক্যামেরার সাথে ইউএসবি পোর্ট দিয়ে স্লাইডের ছবি ও ভিডিও করা যায়। আমি এটা আমেরিকা প্রবাসী ডাঃ ফারুকের মাধ্যমে আমেরিকা থেকে আনিয়ে ছিলাম। হিস্টো, সাইটো রিপোর্টে মাক্রোস্কপিক পিকচার প্রিন্ট করে দিয়ে খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিলাম। পরবর্তীতে আধুনিক কমম্পিউটার ও নেট সমৃদ্ধ মোবাইল ফোন, ট্যাব, লেপ্টপ, স্মার্ট টিভি যখন যেটা এসেছে কিনেছি । বাসায় ওয়াই ফাই কানেকশন দিয়ে এখন ট্যাব, লেপ্টপ, স্মার্ট টিভি, এন্ড্রয়েড মোবাইল দিয়ে নেট ব্যাবহার করে ইউটিউবে কত কিছুই যে দেখা হচ্ছে, শিখা হচ্ছে ! বাসায় এখন তেমন সাধারন টিভি চেনেল দেখা হয় না । যার যার পছন্দ মত ভিডিও বের করে দেখা হয় ।

২০০০ সনে কলেজ থেকে বৃটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে ১২০ জনকে এপ্টেক কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষন দেয়া হয় । আমি ওটার কো-অরডিনেটর ছিলাম । ঐসময় আরও কিছু এডভান্স শিক্ষা পাই । আমি কলেজে ৫/৬ বছর জার্নাল ক্লাবের কো-অরডিনেটর ছিলাম । সেই সময় আমার কম্পিউটার শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে জার্নাল ক্লাবকে আরও সমৃদ্ধ করেছিলাম । তখন ওয়েবসাইট তৈরি ও মেইন্টেইন করার দক্ষতা অর্জন করেছি । বাংলাদেশের সর্বপ্রথম মেডিকেল কলেজের ওয়েবসাইট আমি মেইন্টেইন করতাম । ক্লাবের নোটিশগুলি ওয়েবসাইটে দিয়ে রাখতাম । আরো কত কি! আমার নিজেরো ওয়েবসাইট ছিল । বাংলাদেশের প্রথম এবং এক মাত্র (এখনও) পাবমেড ইন্ডেক্স ইন্টারনেশনাল জার্নাল ময়মনসিংহ মেডিকেল জার্নালের এক্স এম এল কপি আমিই তৈরি করতাম । সব শিখেছি ইন্টারনেটে ।

২০০০ সনেই আমার মাথায় চাপল আরেক বিষয় । বিষয়টা হল টাইপ কম্পোজ তো করতে পারি । কাট, কপি, পেস্ট, ডিলিট করতে পারি । কেন কিভাবে এটা হয় ? এটা জানতে হবে, শিখতে হবে । বন্ধুরাও কেউ জানে না । একজন বললেন "কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাও ।" অফিস থেকে চলে গেলাম কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে । রিসিপশনে দুইটা চেংরা ছেলে বসে আছে । সামনে গেলাম
-আপনার জন্য কি করতে পারি? আমাদের এখানে আছে এই কোর্স, সেই কোর্স ? আপনার কি কোন কোর্স লাগবে ?
-না, মানে আমি একটা বিষয় শিখতে চাই , তা হলো কাট, কপি, পেস্ট, ডিলিট করতে পারি । কেন কিভাবে এটা হয় ? এটা জানতে হবে, শিখতে হবে ।
-তাহলে, কর্নারের ডেস্কে যান ।

কর্নারের ডেস্কে গিয়ে বসলাম। তিনি বুঝালেন
-আপনি যেটা শিখতে চাচ্ছেন সেটা হল কম্পিউটারের এডভান্স শিক্ষা । এটা হল প্রজ্ঞামিং লেঙ্গুয়েজ । এখানে এই কোর্স আছে । এত মাস, এত টাকা লাগবে । প্রতি দিন এখানে দুই ঘন্টা ক্লাস করতে হবে ।
-আমি তো ডাক্তার, মেডিকেল কলেজের শিক্ষক, বিকেলে প্রাক্টিশ করি, সময় তো নাই । কেউ কি আমার বাসায় যেতে পারবেন?
-সরি স্যার ।
-আচ্ছা, কোর্সে ঢুকলে বই পড়তে হবে না? বই গুলি কোথায় পাব?
-বইগুলি সি কে ঘোষ রোডের সংকলন লাইব্রেরীতেই পাবেন ।
-ও, আই সি ! পরে কথা বলব।

আমি বের হয়ে বাসার দিকে না গিয়ে সিকে ঘোষ রোডে সংকলন লাইব্রেরীতে গেলাম। কম্পিউটার সি প্রোগ্রামিং লেংগুয়েজ বাংলায় লিখা বইখানি কিনলাম। লেখক খুব সম্ভব লুতফর রহমান। অনেক পড়লাম। ভালই বুঝলাম। আগ্রহ বেড়ে গেল। কিন্তু লিখা আছে কম্পিউটারে প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার থাকতে হবে। বইয়ের কভারের ভিতরের পাতায় লেখকের ইমেইল এড্রেস পেলাম। ইমেইল করলাম সফটওয়্যার পাব কই? সাথে সাথে উত্তর আসল নিকটস্থ সিডির দোকানে খোজ নিন। অলকা হলের সাথেই এক সিডির দোকানে পেয়ে গেলাম। রাতেই ইন্সটল করলাম। রাত দুইটার সময় আমার প্রোগ্রামিং সাকসেসফুল হল। আমি আমার তৈরি Show বাটনে ক্লিক করি, মনিটরে লিখা ভাসে "The cow is a domestic animal. " Hide বাটনে ক্লিক করি লিখা চলে যায়। আমি এইভাবে আমার তৈরি প্রগ্রামটি বার বার আনন্দের সাথে দেখতে থাকি।

এইভাবে চলল অনেকদিন। মাথায় অনেক প্রোগ্রামিং সমস্যা আসত। সমাধান না করা পর্যন্ত স্বস্তি পেতাম না। যখনি মাথায় সমাধান আসত তখনি কম্পিউটারে বসে পরতাম। সমস্যা নিয়ে ঘুমাতে গেলে ঘুম আসত না। চোখ বন্ধ করে শুইয়ে থাকতাম। মাথায় সমাধান আসলে চুপি চুপি উঠে বিড়ালের মত পা টিপে টিপে কম্পিউটারের কাছে যেতাম। অন করে সমাধান লিখে ফেলতাম।

একদিন একজন বললেন যে আপনি সি প্রোগ্রামিং বাদ দিয়ে ভিসুয়াল বেসিকে করুন। তাতে ভাল করবেন। শুরু হল বই কেনা, সিডি কেনা নতুন করে পড়াশুনা। এটা আমার জন্য সুবিধার মনে হল। এক জন ওস্তাদ হলে কষ্ট কম হত।

ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট -এর শিক্ষক ইঞ্জিনিয়ার এমদাদুল হক আমার বন্ধু। এনিয়ে তার সাথে কথা বললাম। তিনি বললেন
-একদিন আমার বাসায় আসুন। আমার ছেলেটা ভাল বুঝে। সে হয়ত আপনাকে কিছুটা হেল্প করতে পারবে। ওর ডাক নাম সাজু, সাজেদুল ইসলাম।
-কি করে?
-ক্লাস ফোরে পড়ে।
-ফাইজলামী পাইছেন? আন্ডার এস্টিমেট করার তো একটা সীমা আছে?

একদিন তার বাসায় এমনি বেড়াতে গেলাম। তিনি তার ফোরে পড়ুয়া ছেলেকে বললেন "তুমি তোমার আনকেলকে ভিসুয়াল বেসিকে করা প্রোগ্রাম গুলি দেখাও। " আমি তার করা প্রোগ্রাম গুলি দেখে অবিভুত হলাম। কিছু কিছু বিষয় তার কাছ থেকে শিখে নিলাম। তার কোন ওস্তাদ নাই। বাংলায় লিখা গাইড বই দেখে শিখেছে। সেই আমার প্রোগ্রামিং-এ প্রথম ওস্তাদ। ওই টুকুই শিখেছি তার কাছ থেকে। তারপর তাকে আর দেখি নি। কথাও হয় নি। শাহ জালাল ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিএসসি পাস করে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে জব করছে। ময়মনসিংহ টেকনিকাল ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট -এর শিক্ষক রব্বানী সাহেবের কাছে একদিন কিছুটা শিখেছি । দিনাজপুরের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ইমরান একদিন আমার রুমে আসেন বেড়াতে। তার স্ত্রী ডাঃ রোক্সানা আমাদের ডিপার্টমেন্ট-এর প্রভাষক। তার কাছ থেকে কয়েক মিনিট পিএইচপি প্রোগ্রামিং শিখেছি। আমার বড় মেয়ে সাবরীন ইসলাম মুনা কম্পিউটার সাইন্সে বিএসসি ও এমবিএ। তার কাছ থেকেও অনেক শিখেছি। বড় মেয়ে-জামাই টি এম শাহরিয়ার সাজ্জাদ অস্ট্রেলিয়ার পার্থের এডিড কাউন ইউনিভার্সিটি থেকে এবার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পি এইচ ডি শেষ করল। সে তার পি এইচ ডি থিসিসে আমাকে এক্সটারনাল এক্সপার্ট নির্বাচন করেছে। সে একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করেছে যেটা দিয়ে মাইক্রোস্কোপিক স্লাইডের ছবি এনালাইসিস করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হিউম্যান সেল কাউন্ট করা যাবে। যেটা করতে প্যাথলজিস্টদের অনেক সময় ও পরিশ্রম লাগে। খরচও কম লাগবে

সফটওয়্যারে। আমি তাকে হিউমেন টিস্যুর নলেজ শেয়ার করি সে আমাকে সফটওয়্যার নলেজ শেয়ার করে। দুই বছর পর পর সিডনীতে সারা অস্ট্রেলিয়ার সফটওয়্যার ডেভেলপারদের মধ্যে প্রতিযোগীতায় গত ৬ জুন ২০১৭ তারিখে সে টপ ২০ হয়েছে।

২০০২ সনের দিকে আমি ভিসুয়াল বেসিকে উইন্ডোজ এপ তৈরি করি। নাম দেই QuikLab TS. এটা ছিল প্যাথলজি ল্যাবে ব্যাবহার করার সফটওয়্যার। সিডি আকারে বিক্রি করার ইচ্ছা হল। সিডির উপর লেবেল প্রিন্ট করতে হবে। কেমনে করব? কম্পিউটার ব্যাক্তিত্ব মোস্তফা জব্বারের বিজয় কিবোর্ড সিডিটি আমার কাছে ছিল। সিডির উপর একটা ফোন নাম্বার ছিল। রাত ১০ টার দিকে ফোন করে বসলাম
-হ্যালো, আমি ময়মনসিংহ থেকে ডাঃ সাদেক বলছি।
-বলেন।
-আমি একটা সফটওয়্যার তৈরি করেছি। ওটার সিডির লেবেল প্রিন্ট করতে হবে। আপনারা কিভাবে করেছেন একটু বলবেন?
-এ বেপারে মোস্তফা জব্বার ভাইর সাথে কথা বলুন। তার নাম্বার হল……।

আমি তাই করলাম। তিনি আমাকে একদিন পর তার ঢাকার মাল্টিমিডিয়া স্কুলের অফিসে দেখা করতে বললেন। আমি দেখা করলাম। তিনি সব বুঝিয়ে দিলেন। ছয় হাজার টাকায় লেবেল প্রিন্ট করলাম। তিনি সফটওয়্যারটার কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন করতে বললেন আগারগাও কপিরাইট অফিস থেকে। আমি ১ হা জার টাকা ফি জমা দিয়ে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের জন্য দরখাস্ত দিলাম। বাংলাদেশে এটাই হবে ডাক্তারের তৈরি প্রথম মেডিকেল বিষয়ের প্রথম সফটওয়্যার। আমি আরেকটা বিষয়ে প্রথম। সেটা হল আমিই প্রথম বাংলাদেশে গবেষণা করে প্রমান করেছি যে পাকস্থালীর ক্যান্সারের সাথে হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি নামে এক জীবানোর সম্পর্ক আছে। এটা ১৯৯৬ সনে মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। যাহোক, QuickLab TS সফটওয়্যারটি ২০০৪ সন পর্যন্ত বিক্রি করেছি। ততক্ষনে বাংলাদেশে বিদেশ থেকে এই রকম এর চেয়েও ভাল ভাল সফটওয়্যার এসে যাওয়ায় আমি ওটার প্রডাকশন বন্ধ করে দিয়েছি।

মোস্তফা জব্বার ভাই মাঝে মাঝে কম্পিউটার ব্যাবহার এর উপর ময়মনসিংহের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেমিনারে আমাকে দাওয়াত দিতেন। একজন সফল কম্পিউটার ব্যাবহারকারী হিসাবে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতেন মডেলের মত। আমি হ্যান্ড ব্যাগে করে আমার সব ডিভাইস নিয়ে যেতাম। দর্শকদের দেখাতাম।

এরপর মাথায় আসল প্যাথলজি ল্যাব্রেটরির রিপোর্ট করার প্রোগ্রাম তৈরি করার। Laboratory Report Manager নামে একটি সফটওয়্যার তৈরি করলাম। প্রথমে আমার নিজের ল্যাবে ব্যাবহার করে টেস্ট করলাম। ভাল কাজ হল। এবার এটা অনলাইন-এ বিক্রি শুরু করলাম। আমার জানা মতে প্রায় ৯০ টি ল্যাবে এটার ব্যাবহার হচ্ছে। যেসব প্যাথলজি রিপোর্ট-এর নিচ দিয়ে লিখা আছে Software developed by S I Talukder সেই ল্যাবে আমার তৈরি প্রোগ্রাম ব্যাবহার হচ্ছে। ২০১২ সনে এর এক কপি রোমানিয়াতে বিক্রি করে ডলার পেয়েছি।

২০০৬ সনের দিকে ময়মনসিংহ পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্রের ডাইরেক্টর ডাঃ মইনুল ইসলাম ভাই তার প্রতিষ্ঠানের জন্য হরমোন রিপোর্টগুলি ডাটাবেজ আকারে মেনেজ করে রিপোর্ট করার একটি সফটওয়্যার চান। তিনি আমার একজন ভাল বন্ধু। আমি RIA Reporting নামে একটি সফটওয়্যার তৈরি করে দেই। সেই থেকে এই পর্যন্ত সফটওয়্যারটি দিয়ে রিপোর্ট করা হচ্ছে। দেখবেন রিপোর্টের নিচে লিখা আছে Software developed by SI Talukder.

২০১০ সনে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের গাইনি বিভাগের বিশেষজ্ঞ জাহানারা বেগম মুন্নি আপা কথা প্রসংগে বললেন
-আমার হাতের লিখা বুঝা যায় না। তাই ৯০ হাজার টাকা দিয়ে ইউনিভার্সিটির সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে কম্পিউটার প্রোগ্রাম বানালাম সেটা দিয়ে আমি কিছুই করতে পারি না।
-ডাক্তার দিয়ে বানান, তাইলে পারবেন।
-ডাক্তার আবার সফটওয়্যার বানায় কেমনে?
-আমি বানায়ে দিব।
-ঠাট্টা করেন?
-না, আসলেই বলছি।

তাকে আমার কির্তিকলাপ বুঝিয়ে বললাম। তারজন্য Prescription নামে একটি সফটওয়্যার তৈরি করে দিলাম। সেই থেকে এই পর্যন্ত সমস্ত প্রেস্ক্রিপ্সন তিনি আমার সফটওয়্যার দিয়েই করেন। দেখুন তার সব প্রেস্ক্রিপশনের নিচ দিয়ে লিখা আছে Software developed by S I Talukder.

২০০৪ সনের দিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলজের জার্নালের জন্য একটি সফটওয়্যার তৈরি করেছি। ওটার নাম PubMed Citation Maker. ওটা দিয়ে খুব সহজে এবং কম সময়ে জার্নালের xml format PubMed version তৈরি করা হচ্ছে।

২০০৯ সনে ব্রিটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালরের রিসার্চার হাগিগি ইমেইলে প্রস্তাব দিল তার সাথে কোলাবেরেশন করে কলরেক্টাল ক্যান্সার নিয়ে রিসার্চ করার। রিসার্চ করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালরের ডলারের একটা চেক পেয়েছিলাম। এক সময় তাকে ইমেইল করলাম
- বাংলাদেশে এত বিজ্ঞানী থাকতে তুমি আমাকে খুঝে পেলে কিভাবে?
- আমি ইন্টারনেটে বাংলাদেশী বিজ্ঞানী খুঝতেছিলাম যারা ক্যান্সার নিয়ে গবেষণা করে। ইন্টারনেটে খুব বেশী একটা বাংলাদেশি রিসার্চার নেই। তাই সহজেই তোমাকে পেয়ে গেছি।
- এদেশে অনেক রিসার্চার আছে, কিন্তু ইন্টারনেটে তাদের নাম তেমন নেই।

এখন প্রশ্ন করতে পারেন "আপনি একজন ডাক্তার হয়ে কম্পিউটার শিখে আপনার কি লাভ হল?"

আমি কম্পিউটার শিক্ষায় অনেক সময় দিলেও আমার মুল পেশা ডাক্তার। আমি ১৯৮৫ সনে এমবিবিএস পাস করার পর ১৯৯৫ সনে পোস্টগ্রাজুয়েট ডিগ্রী এম ফিল করেছি। ২২ বছর প্যাথলজি বিভাগে শিক্ষকতা করেছি। ২২ বছর ল্যাবরেটরি প্রাক্টিস করে ক্যান্সারসহ বহু রোগ ডায়াগনোসিসে সহযোগীতা করেছি। প্যাথলজি বিষয়ে ২টি বই লিখেছি। এপর্যন্ত আমার ৮৩টি রিসার্চ আর্টিকেল মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই আমার মুল পেশাকে অবহেলা করিনি। কম্পিউটার শিখে আমার নিজের কাজ, আমার কলিগদের কাজ, আমার আত্বিয়দের কাজ, আমার বন্ধুদের কাজ, বিভিন্ন প্রতিস্ঠানের কাজ আমি সহজ করে দিয়েছি। সময় ও খরচ কমিয়ে দিয়েছি। আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যাবহার করে আমি অনেক কিছু উপভোগ করতে পারছি। আমার অনেক কলিগ জানেন না কিভাবে ইউটিউব ব্যাবহার করতে হয়, কিভাবে ফেইসবুক ব্যবহার করতে হয়। কিভাবে স্মার্ট টিভি ও অন্যান্য স্মার্ট ডিভাইস ব্যাবহার করতে হয় তারা জানেন না। এগুলি এঞ্জয় না করেই হয়ত পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন। আমি কয়েকটি ওয়েবসাইট তৈরি ও মেইন্টেইন করে আমাদের দেশের তথ্য সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে সহায়তা করছি। সফটওয়্যার ও বই বিক্রি করে পেশাগত আয়ের বাইরেও কিছু আয় করতে পারছি। আমি ঘরে বসে অনলাইনে তিন

জেলার তিনটি মেডিকেল জার্নাল সম্পাদনা করছি কম্পিউটার জানার কারনে। আমার প্রকাশনা গুলি রিসার্চগেইট ওয়েবসাইটে দিয়ে বিশ্বে এগুলির রেফারেন্সের সুজুগ করে দিয়েছি। তাদের সার্ভে অনুযায়ী আমার রেংকিং দশে প্রায় দশ।

=======

ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার

ফেইসবুক পোস্ট

স্মৃতির পাতা থেকে

২৬/৬/২০১৭